International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VII, Issue-I, January 2021, Page No. 65-70
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v6.i4.2020.1-8

বাংলায় বৌদ্ধধর্মের ক্রমবিকাশ

রাজকুমার পণ্ডিত
গবেষক, দর্শন বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারতবর্ষ

Abstract:

The greatest manifestation of human glory is through the Tathagata Buddha. Just as the Buddha is the embodiment of loving-kindness and compassion in the whole world, so he flooded the whole world with the nectar of salvation from sorrow. That is why the Buddha's principled religion conveys a message of hope to the peoples. During the lifetime of the Buddha, there were differences of opinion on various issues. That situation became more chaotic after the Buddha's Mahāparinirvāṇa. In the post-Buddha period, some of his followers once re-arranged religion to make it attractive and popular with the people. Naturally, tantrism, idol worship and various rituals came into the religion. The actual religion and philosophy of the Buddha sank under these external means. Along the pathway of history, Buddhism in Bengal has gradually evolved into various forms; in the similar pathway, the Bengali Buddhists who were devoted to this religion, have gradually turned from being the majority of the humankind in this country to became once a minority humankind; I have only tried to explain it in a very brief form in this article. Although Buddhism once became extinct in the whole of ancient India, it was not completely eradicated because of these Bengali Buddhists. From that time onwards, some number of Bengali Buddhists maintained the religion of Buddha on this continent. Although they are insignificant in number, they are still there today embracing the religion of the Buddha. Most of them have remained in Bengal, and the rest have left Bengal for livelihood or the persecution by foreign powers and are scattered in different parts of India.

Keywords: Bangadesh, Buddha, Buddhism, humanist religion, tantrism.

এশিয়ার আলোক-বর্তিকা মহামতি গৌতম বুদ্ধের মুখনিঃসৃত উপদেশ ও বাণীর উপর নির্ভর করে এই জগৎ ও জীবন বিষয়ক যে মতবাদ গড়ে উঠেছিল তা বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন নামে সুবিদিত। মানবদরদী এই ধর্ম তার সক্রিয় চিন্তাধারার বিবর্তনে আজ সমগ্র বিশ্বের দরবারে ছড়িয়ে পড়েছে। বৌদ্ধধর্ম অনুষ্ঠানের ধর্ম নয়, অনুশীলনের ধর্ম। বাংলায় সেই বৌদ্ধধর্মের ক্রমবিকাশের ধারা বিষয়ক কোনো নির্ভরযোগ্য প্রামাণ্য গ্রন্থ আজও পণ্ডিতদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। অবিভক্ত বাংলায় নানান পরিবর্তন এসেছে, তাছাড়া পূর্ব পাকিস্তান তথা অধুনা বাংলাদেশ বিভক্ত হওয়ার ফলে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রামাণ্য পুঁথিপত্র সংগ্রহ করাও মোটেই সহজসাধ্য ব্যাপার নয়।

বর্তমানে যে ভূখণ্ড সমূহ 'পশ্চিমবঙ্গ' এবং 'বাংলাদেশ' নামে সুবিদিত, প্রাচীনকালে সেই ভূখণ্ড কোন একটি বিশেষ নামে সুবিদিত ছিল না। পশ্চিমবঙ্গের নিম্ন অংশে প্রধানত গঙ্গার পশ্চিমভাগ কথা বীরভূম-বর্ধমান সংলগ্ন অঞ্চল ছিল 'রাঢ়' বা 'সুম্প'

নামে খ্যাত; উত্তরবঙ্গ 'পুণ্ড্র' নামে খ্যাত; বাংলাদেশের ঢাকা, ফরিদপুর ও যশোর সংলগ্ন অঞ্চল ছিল 'বঙ্গ' নামে খ্যাত এবং তৎ নিম্নবর্তী সংলগ্ন অঞ্চল ছিল 'বঙ্গাল' নামে খ্যাত; নোয়াখালী ও কুমিল্লা সংলগ্ন অঞ্চল ছিল 'সমতট' নামে খ্যাত; চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট সংলগ্ন অঞ্চল ছিল 'হরিখেল' নামে খ্যাত। উপরোক্ত এই সমস্ত এলাকা সমূহকে একত্রে 'বঙ্গদেশ' বা 'বাংলাদেশ' নামে সুপরিচিত ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে বঙ্গদেশে আর্য সভ্যতার প্রভাব ও প্রসার ছিল, কিন্তু খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে মহামতি বুদ্ধের আবির্ভাবের সময়কাল থেকে ক্রমান্বয়ে বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ও প্রসার শুরু হয়।

প্রাচীন বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম বুদ্ধদেবের জীবদ্দশাতেই প্রসার লাভ করেছিল এবং বুদ্ধ স্বয়ং বঙ্গদেশে পরিভ্রমণ করেছিলেন। 'অঙ্গুত্তর নিকায়ে' ব্যাখ্যাত হয়েছে "বঙ্গান্ত পুত্র" নামে প্রসিদ্ধ এক যুবা ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করেছিলেন বুদ্ধদেবের নিকটে, তাই সন্দেহাতীত ভাবে বলা যায় এই বঙ্গান্ত পুত্র বঙ্গদেশ থেকেই বুদ্ধের নিকট এসেছিলেন। 'থেরগাথা' ও 'অপাদানে' "বঙ্গীশ" নামে সুপ্রসিদ্ধ এক বাঙালী ভিক্ষু ও স্বনামধন্য কবির পরিচয় মেলে, যিনি কবিতা রচনা করে বুদ্ধকেও শুনিয়েছিলেন। তিনি বিদ্যালাভের জন্য রাজগৃহে বসবাসকালে স্থবির সারিপুত্তের সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ পান, এবং অতঃপর বুদ্ধের সান্নিধ্য লাভ করে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। 'ভেলপত্ত জাতক' এবং 'ধম্মপদ অটঠকথা'য় ব্যাখ্যাত হয়েছে বুদ্ধদেব জীবদ্দশাতেই 'সুমহ' রাজ্যের 'সেতক' নগরে পরিভ্রমণ করেছিলেন, এই সুমহ রাজ্য ছিল প্রাচীন বঙ্গের অন্তর্গত। এই পরিভ্রমণের কথা ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে তিব্বতী সুপ্রসিদ্ধ লেখক 'সুম্পা' কর্তৃক লিখিত 'পাগ-সাম-জোন-জ্যাং' গ্রন্থেও বর্ণনা রয়েছে, যা ধর্মপদ অটঠকথার বর্ণনার সহিত হুবহু মিল পরিলক্ষিত হয়:

অনাথপিন্ডিক শ্রেষ্ঠীর এক কন্যা 'চুলসুভদ্রা'র বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল পুন্ড্রবর্ধনের এক বিত্তবান পরিবারে। পুন্ড্রবর্ধন বর্তমান বাংলাদেশের বগুড়া, রংপুর ও দিনাজপুর সংলগ্ন অঞ্চল। শ্রেষ্ঠী কন্যা অবৌদ্ধ শ্বশুরকূলের সকলকে নানানভাবে বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তুলেছিলেন। চুলসুভদ্রার আমন্ত্রণ গ্রহণ পূর্বক বুদ্ধদেব পুন্ড্রবর্ধনে পদার্পণ করেন ও আতিথ্য গ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব একটি পালি গাথার বর্ণনা করেছিলেন:

"দূরে সন্তো পকাসেন্তি হিমবন্তো'ব পববতো,
অসন্তে'থ ন দিসসন্তি রত্তি খিতা যথা সরা।"

—অর্থাৎ, শীলবান সৎ ব্যক্তি হিমালয় পর্বত সদৃশ্য অতি দূর থেকে প্রকাশিত হন, পরন্তু অসৎ ব্যক্তি রাত্রিকালীন নিক্ষিপ্ত শর তুল্য দৃশ্যপটে উপলব্ধ হন না।[১]

এছাড়াও, বুদ্ধদেব জীবদ্দশাতেই যে বাংলায় এসেছিলেন তা চৈনিক পরিব্রাজক 'হিউয়েন সাঙ' এর বর্ণনাতেও সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। তাঁর বর্ণনায় ব্যক্ত হয়েছে বুদ্ধদেব পুন্ড্রবর্ধন, সমতট (কুমিল্লা) ইত্যাদি স্থানে সপ্ত দিবসকাল ধর্মোপদেশ দান করেছিলেন। এবং সেই স্থান থেকে কর্ণসুবর্ণ (বহরমপুর) হয়ে মগধ (বিহার)-এ এসেছিলেন। প্রাগুক্ত কয়েকটি উদাহরণের দ্বারা স্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বুদ্ধদেবের জীবদ্দশাতেই বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম বিকশিত হয়েছিল।

মৌর্য যুগে পৌণ্ড্র রাজ্য সম্রাট অশোকের (রাজত্বকাল: ২৬৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ২৩২ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) শাসনাধীন ছিল এবং সেই সময় বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম বিদ্যমান ছিল। তিনি বুদ্ধের পৌণ্ড্ররাজ্যে শুভাগমন ও ধর্মদেশনা চিরজাগ্রত করার জন্য একটি স্তূপ ও বিহার নির্মাণ করিয়েছিলেন। এছাড়াও সমগ্র বঙ্গদেশে মোট ৭০ টি বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করিয়েছিলেন, তন্মধ্যে ২২ টি ছিল শুধু তাম্রলিপ্ততেই। ভিক্ষু ছাড়া ভিক্ষুনীরাও সেই সময় বিহারে থাকতেন।

চৈনিক পরিব্রাজক 'ফা-হিয়েন' (পঞ্চম শতাব্দী) ভারতবর্ষে আগমনের পর একসময় তাম্রলিপ্ততে প্রায় দুই বৎসরকাল যাবৎ বসবাস করেছিলেন। তিনি সেই সময়ে তাম্রলিপ্ততে বহু বৌদ্ধবিহার পরিদর্শন করেছিলেন, তা তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে জানা যায়। সেই সময় বৌদ্ধধর্ম সারা বঙ্গদেশে বিস্তারলাভ করেছিল।[২] পরবর্তীকালে সপ্তম শতাব্দীতে 'হিউয়েন-সাঙ' এসেও এসকল বিহার পরিদর্শন করেছিলেন বলে তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে বর্ণনা করেছিলেন। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের বিশিষ্ট অধ্যাপক ড: সুধীর রঞ্জন দাশের তত্ত্বাবধানে কর্ণসুবর্ণ স্টেশন সংলগ্ন যদুপুর গ্রামের অন্তর্গত রাজবাড়ি ডাঙার প্রত্নস্থল খননকার্য শুরু করেন। সেখান থেকে প্রথম বৎসরেই পাওয়া যায় মৌর্য যুগের নানান প্রত্নবস্তু ও পোড়ামাটির শীলমোহর। সুতরাং বলা যায়, খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ থেকে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত সমগ্র বঙ্গদেশব্যাপী বৌদ্ধধর্ম সুপ্রসিদ্ধ ও সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। আরেক বিশিষ্ট চৈনিক পরিব্রাজক 'ইৎসিং' পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে বরেন্দ্র (উত্তরবঙ্গ)-র বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ে, বিহারিলত্র (রাজসাহী)-তে বহু মহাযান দেবদেবীর মূর্তি উদ্ধারের কথা উল্লেখ করেছেন। তৎকালীন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা ছিল ক্রমহ্রাসমান, ফা-হিয়েন (পঞ্চম শতাব্দী) যে সংখ্যার কথা বলেছেন তার থেকে হিউয়েন-সাঙ

(সপ্তম শতাব্দী) আরও হ্রাসমান সংখ্যার কথা বলেছেন। এবং তৎপরবর্তীকালে ইৎসিং (নবম শতাব্দী) বাংলাদেশে অত্যন্ত ক্ষীণ অবস্থা পরিলক্ষিত করেছিলেন।

সম্রাট অশোক যে স্তুপগুলি নির্মাণ করেছিলেন, তন্মধ্যে সাঁচী স্তুপ অন্যতম। এই ঐতিহাসিক স্তূপ নির্মাণকার্যে বহু মানুষ মুক্তহস্তে প্রভূত ধন-সম্পদ প্রদান করেছিলেন। সাঁচী স্তূপের তোরণ গাত্রে দাতা হিসেবে পুন্ড্রবর্ধনের ধর্মদত্তা ও ঋষি নন্দন নামে দু'জন উপাসকের নাম উৎকীর্ণ রয়েছে। পন্ডিত বুলারের মতে, এই লিপি খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের প্রথম দিকে। অতএব দ্বিতীয় শতকের মধ্যে বঙ্গদেশে বৌদ্ধ ধর্মের সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, তা সন্দেহাতীত ভাবে বলা যায়।[৩]

সম্রাট অশোকের পরবর্তী পর্যায়ে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন কুষাণ সম্রাট কনিষ্ক (রাজত্বকাল: ৯০-১০০ খ্রিষ্টাব্দ)। তাঁরই রাজত্বকালে বৌদ্ধ সম্প্রদায় দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে— হীনযান ও মহাযান সম্প্রদায়ে। কনিষ্ক মহাযান মতাবলম্বী ছিলেন, এবং আজীবন এই মতের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। হিউয়েন-সাঙ এর বিবরণীতে কনিষ্কের পূর্ব-ভারত বিজয়ের উল্লেখ রয়েছে। পরবর্তীকালে তমলুক, মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও বগুড়াতে (অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত) কনিষ্কের রাজত্বকালীন মুদ্রা আবিষ্কৃত হওয়ায় অনেক বিদগ্ধ ঐতিহাসিক পণ্ডিত অনুমান করেছেন, বঙ্গদেশের কোন একটি অংশ তার সম্রাজ্যাধীন ছিল। খ্রিষ্টপূর্বাব্দে বৌদ্ধধর্ম সম্প্রসারনে অশোকের অবদান যেমন সর্বোৎকৃষ্ট, তদনুরূপ অবদান ছিল খ্রিষ্টীয় অব্দে কুষাণ সম্রাট কনিষ্কের।

খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে থানেশ্বরের রাজা হর্ষবর্ধনের সময়কালে (রাজত্বকাল: ৬০৬-৬৪৭ খ্রিষ্টাব্দ) বাংলায় বৌদ্ধধর্মের অত্যন্ত ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণ হয়েছিল। তৎকালীন সময়কালে ব্যক্তিবর্গের অভ্যন্তরে সৌভ্রাতৃত্ববোধ, করুণা, মমত্ববোধ, ঐক্য ও সাম্যতা বোধের ভাবাদর্শে অধিক পরিমাণে সম্প্রসারিত হয়েছিল। তাঁর রাজত্বে বঙ্গদেশে ৭০ টির অধিক সঙ্ঘ এবং সমস্ত সঙ্ঘে প্রায় ৮,০০০ এর অধিক ভিক্ষু বসবাস করতেন বলে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ এর ভ্রমণ বৃত্তান্তে পাওয়া যায়। সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে বঙ্গদেশে পালবংশীয় রাজাগণ রাজত্ব করেছিলেন, সেই সময় বৌদ্ধধর্ম বিশালভাবে বিস্তারলাভ করেছিল। মগধে নির্মিত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় পাল রাজাদের বদান্যতার ফলে অধিক ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছিল। হিউয়েন-সাঙ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান আচার্য তথা বাংলার কৃতী সন্তান পণ্ডিত প্রবর 'ভিক্ষু শীলভদ্র'-এর পদতলে উপবিষ্ট হয়ে অধ্যয়ন করেছিলেন। এই সময়কালে আরেক পণ্ডিত প্রবর বাঙালী বৌদ্ধাচার্য সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তিনি হলেন 'আচার্য চন্দ্রগামী'। তিনি বরেন্দ্র অঞ্চলে বসবাস করেন এবং যোগাচার মতের অনুগামী ছিলেন। দশম থেকে একাদশ শতাব্দীর আরেক বাঙালী কৃতী সন্তানের এবং তৎকালীন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক সদৃশ সুপণ্ডিত ও দার্শনিক, বিক্রমশীলা মহাবিহারের প্রধান আচার্য 'অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান'। তিব্বতের রাজার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে তিনি অত্যন্ত দুর্গম হিমালয় পর্বতমালা অতিক্রম করে তিব্বত প্রদেশে এসে পৌঁছান। সেখানে তিনি দীর্ঘ ১৩ বৎসর কাল অতিবাহিত করে বৌদ্ধধর্মের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[৪] তাঁর এই অনন্য ও অসাধারণ কৃতিত্বের কথা বঙ্গ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লেখনীতে প্রতিধ্বনিত হয়েছে:

"বাঙালী অতীশ লঙ্ঘিল গিরি তুষারে ভয়ঙ্কর
জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙালী দীপঙ্কর।"[৫]

—বাঙালী অতীশ দীপঙ্কর তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের নবজাগরণের সূচনা করেছিলেন। তাঁর লেখনীর ছোঁয়ায় ১৭৫ টি'র অধিক দার্শনিক গ্রন্থসমূহের আবির্ভাব হয় এবং তিনি বৌদ্ধ ধর্মের এক মানবতাবাদী ব্যাখ্যা প্রদান করেছিলেন। তিব্বতী ও চৈনিক বৌদ্ধদের কাছ থেকে অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান এখনও পর্যন্ত দ্বিতীয় বুদ্ধের ন্যায় পূজিত হয়ে থাকেন।

অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বঙ্গদেশে চন্দ্র ও পাল রাজাদের রাজত্বকালে মহাযান বৌদ্ধধর্মের সুবর্ণযুগে পর্যবসিত হয়েছিল। সোমপুরী, ওদন্তপুরী, বিক্রমশীলা মহাবিহার রাজা মহিপাল ও জয়পালের উল্লেখযোগ্য ও সুমহান কীর্তি। ধর্মপাল বঙ্গদেশে পঞ্চাশোর্ধ বৌদ্ধধর্ম-বিদ্যায়তন সুপ্রতিষ্ঠত করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তার উল্লেখ তিব্বতী সাহিত্যে রয়েছে।

বঙ্গদেশে তৎকালীন সময়ে অত্যন্ত বিদ্বান ও বিদগ্ধ সুপণ্ডিতদের কাছে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনশাস্ত্র অধ্যায়ন করতে চীন, তিব্বত, কাশ্মীর, সিংহল, বর্মা প্রভৃতি বহু দেশ থেকে জ্ঞানপিপাসু পণ্ডিত প্রবর ব্যক্তিবর্গ তাঁদের জ্ঞানতৃষ্ণাকে চরিতার্থ করার জন্য বঙ্গভূমিতে পদার্পণ করেছিলেন এবং তৎসঙ্গে এই দেশের মূল্যবান পুঁথিসমূহ তাঁদের দেশের ভাষায় অনুবাদ করে তাঁদের নিজ ভূমে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তিব্বতের ঐতিহাসিক তারানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে— "পাল যুগের অবসানে বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের চরম দুরবস্থা দেখা দেয়, পাল যুগে তৈরী বহু বৌদ্ধ মন্দির ও বিহার ভগ্নপ্রায় ও ভগ্ন অথবা বিধর্মী ব্যক্তিবর্গের দ্বারা অধ্যুষিত"। পাল বংশের পর বঙ্গদেশে সেন ও বর্মন রাজাদের রাজত্বকাল শুরু হয়। সেন রাজারা (কর্ণাটকের ব্রাহ্মণ) এবং বর্মন রাজারা (কলিঙ্গের গোঁড়া ব্রাহ্মণ) বহিরাগত হিসেবে বঙ্গদেশ ও বাঙালীদের প্রতি তাঁদের কোনোরূপ সৌহার্দ্যপূর্ণ ও মমত্ববোধ ছিল না, এবং তাদের বৌদ্ধ বিদ্বেষের রোষানলে পড়লো বঙ্গদেশের বৌদ্ধগণ।

দ্বাদশ শতাব্দীতে তুর্কী হানাদার বখতিয়ার খিলজী মগধ প্রদেশে হানা দিয়ে এবং নালন্দা বৌদ্ধ বিহার ও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস করেছিল এবং পুঁথিপত্র সমস্ত আগুনে ভস্মীভূত করেছিল। এছাড়াও ওদন্তপুরী, বিক্রমশীলা মহাবিহার সহ অন্যান্য বৌদ্ধবিহার লুঠ ও ধ্বংস করেছিল, মগধ প্রদেশে অধিষ্ঠিত বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। এই ঘটনার প্রায় এক বৎসর পর গয়া, ঝাড়খণ্ডের মধ্য দিয়ে নদীয়া আক্রমণ করে ক্রমে ক্রমে সারা বঙ্গদেশ দখল করেছিল। এখানেও বৌদ্ধ বিহার সমূহ নির্বিচারে লুঠ ও ধ্বংস, ভিক্ষুদের হত্যালীলা চালিয়েছিল, পুঁথিপত্র পুড়িয়ে দিয়েছিল। অসংখ্য বৌদ্ধ ভিক্ষু বাংলাদেশ ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে গিয়েছিল। প্রাণ বাঁচাতে বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল এবং এভাবেই বঙ্গদেশে ইসলাম ধর্মের সূত্রপাত হয়েছিল।

ভারতভূমিতে অষ্টম শতাব্দীতেই বৌদ্ধধর্মের অবলুপ্তি হতে শুরু করেছিল এবং মধ্যযুগে অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতকের শুরুতেই ভারতবর্ষ থেকে এর চিরবিলুপ্তি ঘটতে থাকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ছয় শতক ভারতভূমিতে মুসলিম শাসনাধীন ছিল। ভারতবর্ষের এই সময়কাল বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ হিসেবে বিবেচিত। বঙ্গদেশও এর প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেনি কোনোমতেই। পঞ্চদশ শতক থেকে বৌদ্ধধর্ম বঙ্গদেশ থেকে ক্রমান্বয়ে বিলুপ্ত হতে শুরু করে। শুধুমাত্র কিয়দাংশ অবশিষ্ট ছিল চট্টগ্রাম ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে। সেখানে বৌদ্ধ ধর্মের পুনর্জাগরণ শুরু হয় উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে।

মন্ত্রশক্তি, বশীকরণ, তুকতাক প্রভৃতির উদ্ভব হয়েছিল অথর্ববেদের সময়কাল থেকেই এবং প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষের ধর্ম জীবনের মধ্যে তা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। কালক্রমে নিম্ন শ্রেনীর এক ব্যাপক সংখ্যক মানুষ একসময় মহাযানী বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছিল। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তাদের প্রচলিত ধ্যান-ধারণা, যাদু-টোনা, মন্ত্রশক্তি, বশীকরণ, তুকতাক খুবই সাবলীলভাবে মহাযানী বৌদ্ধধর্মের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিল। সুতরাং বলা যায়, প্রথম তন্ত্রসাধনার উদ্ভব করেন মহাযানী বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ কর্তৃক এবং তারা তন্ত্র সাধনার মধ্য দিয়ে বৌদ্ধধর্মের গূঢ়তত্ত্বকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। এভাবেই বঙ্গদেশে তন্ত্র সাধনার পীঠস্থানে পরিণত হয়। এই নতুন ধ্যান কল্পনার পথই হলো 'মন্ত্রযান'। মন্ত্রযান ও বজ্রযান- এই দুই প্রকার তন্ত্রসাধনা ও ধ্যান কল্পনার উৎপত্তি লাভ করে মহাযানী বৌদ্ধধর্মে। চিত্তে বজ্র ভাবে বোধিজ্ঞান কে লাভ করা যায় বলে এই সাধনাক 'বজ্রযান' তন্ত্রসাধনা বলা হয়েছে। বজ্রযান তন্ত্রসাধনা থেকে পরবর্তীকালে আরো এক তন্ত্র সাধনার উদ্ভব হয়, যাকে 'কালচক্রযান' তন্ত্রসাধনা বলা হয়। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই ত্রিকাল চক্রের মতো চলছে অবিরত এবং এই কাল সবকিছু সৃষ্টি করে। এই তন্ত্রসাধনার উদ্দেশ্য হল, যোগ সাধনার বলে প্রাণক্রিয়া রুদ্ধ হলে কালকেও স্তব্ধ করা যায়। তিব্বতে এইরূপ তন্ত্রসাধনা সুপ্রসিদ্ধ ছিল। দালাই লামা'ও যে এই তন্ত্র সাধনায় বিশ্বাসী ছিলেন, এমন কথাও শোনা যায়। এই তিন প্রকার তন্ত্রের মধ্যে মন্ত্রযান তন্ত্রই হলো কেবলমাত্র মন্ত্রশক্তির সাহায্যে শক্তি আহরণ করার উপায়, আর বাকি দুটো হল মুক্তির পথ মাত্র।[৬] মহাযানী মতে, এক জন্মে বুদ্ধত্ব লাভ হয় না। তার জন্য বহু জন্ম-জন্মান্তর পরিভ্রমণ প্রয়োজন। এই মতের উপর নির্ভর করে তাঁরা 'সহজযান' নামক আরেক তন্ত্রসাধনার আবির্ভাব ঘটালো। এই তন্ত্র সাধনায় মন্ত্র, পুজার্চাদি ব্যতিরেকে শুধু তন্ত্র সাধনার দ্বারা একজন্মেই পরমসত্য সহজ উপায় লব্ধ বলেই তা সহজযান নামে খ্যাত (৮-ম শতাব্দী)।

মহাযানী তন্ত্রসাধনায় এক বিশেষরূপ ধ্যান কল্পনার কথা কথা বলা হয়, যা কোনমতেই বুদ্ধের ধর্ম-দর্শন নয়। মন্ত্রশক্তি, বশীকরণ, তুকতাক, যাদুশক্তি প্রভৃতি বুদ্ধের মতাদর্শে নেই। বৌদ্ধধর্মে কোন দেবদেবীর অস্তিত্ব নেই, এমনকি বুদ্ধ পূজাও নিষিদ্ধ। মহাযানীরা বুদ্ধা পুজা শুরু করল এবং পরবর্তীকালে তারা নানা দেবদেবীর উদ্ভব ঘটালো। মহাযানীরা বুদ্ধের মতাদর্শ পরিত্যাগ করে এক নতুনভাবে ধ্যান পদ্ধতির আবির্ভাব ঘটালো; তাই বলা যায়, মহাযানীগণ বুদ্ধের প্রকৃত মতাদর্শ থেকে বহু দূরে সরে গেছে।

পরবর্তীকালে বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম বিপুলভাবে বিস্তারলাভ পরিলক্ষিত হয়। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যা ৯.১৩ কোটি (৯১,৩৪৭,৭৩৬), তার মধ্যে ০.৩১% বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, যা সংখ্যাগত ভাবে চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে।[৭] বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের মোট বাঙালী বৌদ্ধ মন্দির রয়েছে প্রায় ৪৯ টি। এবং বিদেশি বৌদ্ধ মন্দির রয়েছে প্রায় ৮ টি,

তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো শ্রীলঙ্কার বৌদ্ধ পন্ডিত অনাগরিক ধর্মপাল (১৮৬৪-১৯৩৩) কর্তৃক ১৮৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত 'মহাবোধি সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া' (কলেজ স্কোয়ার)। বাংলায় বৌদ্ধধর্মের অত্যাধিক বিস্তারের কারণ ছিল, সাম্যবাদী ও মানবদরদী এই ধর্মকে মানুষ তার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে ঠাঁই দিয়েছিল। তাই বঙ্গ-জননীর সন্তান-সন্ততিরা এই ধর্মকে আপনার করে নিয়েছিল স্বাভাবিকভাবেই।

মহামতি বুদ্ধের প্রতি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আন্তরিক শ্রদ্ধা, ভক্তি ও অনুরাগে নিদর্শন তাঁর জীবনযাত্রা ও সাহিত্যসৃষ্টিতে সমুজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। বৈশাখী পূর্ণিমাতে বুদ্ধকে উদ্দেশ্য করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একখানি সঙ্গীতের রচনা করেছিলেন, যেখানে তিনি মহাসঙ্কটের দিনে সকল প্রকার দুর্গতি ও ভয় অপনোদনকারী বুদ্ধদেবের শরণ নিয়েছেন:

"সকল কলুষতামাস হর',
জয় হোক তব জয়।
অমৃতবারি সিঞ্চন কর'
নিখিলভূবনময়।
মহাশান্তি, মহাক্ষেম,
মহাপুণ্য, মহাপ্রেম!
জ্ঞানসূর্য-উদয়-ভাতি
ধ্বংস করুক তিমিররাতি,
দুঃসহ দুঃস্বপ্ন ঘাতি
অপগত কর' ভয়।"[৮]

জীবঘাতী উৎপীড়নের প্রতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আজীবনব্যাপী ধিক্কার জানিয়েছিলেন। তাই, জীবনের অন্তিম পর্যায়ে তিনি নানান প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও পশুবলি বিরোধী আন্দোলনের পক্ষাবলম্বন করেন সর্বসমক্ষে। রবীন্দ্রনাথ একসময় শিলাইদহের চরে পাখি হত্যা নিষিদ্ধ করেছিলেন। আর, এখনো শান্তিনিকেতনের আশ্রম অঞ্চলে প্রাণী হত্যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ রয়েছে।

নিখিল বিশ্বমানবের দুঃখ-দুর্দশা থেকে পরিত্রাণের দৃঢ় সংকল্প নিয়ে বুদ্ধদেব রাজ্যসুখভোগ ও সংসার জীবন পরিত্যাগ করেছিলেন। এই ত্যাগ ও প্রেমের দ্বারা তিনি মানব হৃদয় তথা নিখিল বিশ্বকে জয় করেছিলেন, আর সেটাই তো প্রকৃতপক্ষে বিজয় লাভ। তাই রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন, "বুদ্ধই পৃথিবী জয় করেছিলেন, আলেকজান্ডার করেননি"। কারণ, আলেকজান্ডার মাত্রাতিরিক্ত লোভ-লালসা ও অহংসর্বস্ব'তার বশবর্তী হয়ে অস্ত্রের দ্বারা যে ভূভাগ জয় করেছিলেন, তা সত্যিকারে বিজয় কখনোই হতে পারে না।[৯]

স্বামী বিবেকানন্দ বুদ্ধের জীবনচর্যা ও কর্মসমূহ দ্বারা অতিশয় প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন এবং তাকে নিখিল বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ "লোকগুরু" বলে অভিহিত করেছিলেন। বিবেকানন্দের ভাষায় বলা যায়, এ জগতে একমাত্র বুদ্ধ'ই কর্মযোগের শিক্ষা সর্বাংশে কার্যে পর্যবসিত করেছিলেন। বিবেকানন্দ আরও বলেছিলেন, বৌদ্ধ ধর্ম ব্যতীত নিখিল বিশ্বের আর কোন ধর্মই রক্তক্ষয় ছাড়া একপা'ও অগ্রসর হতে সক্ষম হয়নি। কেবলমাত্র ত্যাগ, প্রেম, করুণা ও মমত্ববোধের দ্বারা লক্ষ লক্ষ মানুষকে আশ্রয় প্রদান করা অন্য কোন ধর্মের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়। তথাগত বুদ্ধের প্রতি স্বামীজীর অপরিমেয় শ্রদ্ধা-ভক্তির যে চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছিল তা তার বিভিন্ন বক্তৃতার মধ্যে সুপরিস্ফুট হয়েছে: "আমি বুদ্ধ নই, তথাপি একভাবে আমি বৌদ্ধ।" "আমি বুদ্ধের দাসানুদাসেরও দাস।" "বুদ্ধদেব আমার ইষ্ট, আমার ঈশ্বর।"

অতীতের ইতিহাসের ঐতিহ্য ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বৌদ্ধধর্মকে "মানব পূজারী" ধর্ম বলা যায়। বর্তমানে নিখিল বিশ্বব্যাপী মানবতার যে চরম সঙ্কট পরিলক্ষিত হচ্ছে, এই চরম সঙ্কট থেকে পরিত্রাণের জন্য বৌদ্ধ ধর্মের নৈতিকতা অধিক ফলপ্রসূ হতে পারে।

তথ্যসূত্র:

১. মহাথের. রাষ্ট্রপাল, বাঙ্গালী বৌদ্ধদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, বাংলায় বৌদ্ধধর্ম, নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠন, কলকাতা, ২০০৭, পৃ: ৩৫-৩৬.

২. চৌধুরী. সাধনকমল, বাংলায় বৌদ্ধধর্ম ও বাঙ্গালী বৌদ্ধদের ক্রমবিবর্তন, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০২, পৃ: ২-৩.

৩. মহাথের. রাষ্ট্রপাল, বাঙ্গালী বৌদ্ধদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, বাংলায় বৌদ্ধধর্ম, নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠন, কলকাতা, ২০০৭, পৃ: ৩৬.

৪. মহাথের. রাষ্ট্রপাল, বাঙ্গালী বৌদ্ধদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, বাংলায় বৌদ্ধধর্ম, নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠন, কলকাতা, ২০০৭, পৃ: ৩৬-৩৭.

৫. চৌধুরী. হেমেন্দুবিকাশ, প্রথম আন্তর্জাতিক বাঙালী: অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, বৌদ্ধধর্ম ও বাঙ্গালী বৌদ্ধদের ক্রমবিবর্তন, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০২, পৃ: ১০৭.

৬. চৌধুরী. সাধনকমল, বাংলায় বৌদ্ধধর্ম ও বাঙ্গালী বৌদ্ধদের ক্রমবিবর্তন, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০২, পৃ: ১৪-২১.

৭. https://www.census2011.co.in/data/religion/state/19-west-bengal.html (Checked_15.01.2021)

৮. ঘোষ. বারিদবরণ, উনিশ শতকে বাঙালির বুদ্ধচর্চার একটি খসড়া, বাংলায় বৌদ্ধধর্ম, নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠন, কলকাতা, ২০০৭, পৃ: ১৯০.

৯. 'ঘরে বাইরে', রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খণ্ড, পৃ: ৫০১. (মাষ্টারমশায়ের প্রতি নিখিলেশের উক্তি)

গ্রন্থপঞ্জী:

1.চক্রবর্ত্তী. শ্রী শরচ্চন্দ্র, স্বামি শিষ্য সংবাদ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা.

2. চৌধুরী. সাধনকমল, বাংলায় বৌদ্ধধর্ম ও বাঙ্গালী বৌদ্ধদের ক্রমবিবর্তন, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০২.

3.বড়ুয়া. ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ, বাংলায় বৌদ্ধধর্ম, নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠন, কলকাতা, ২০০৭.

4.সারওয়ার. মো: গোলাম ও রহমান. মো: মতিউর, প্রাচীন বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের ক্রমবিকাশ: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা, Development Compilation Vol. 02. No. 01. August 2009.

5.সেনগুপ্ত, ড. শংকর, দি রিলিজিয়ন অফ ম্যান, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৪.

6.স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, দশম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৯৬১.